প্রথম শীল্ড জয়ের শতবর্ষ ও মোহনবাগান ক্লাব

দেবজিৎ রায়

এ. ডি. এস. আর.,শ্যামপুর

সেই মহূর্ত :

খেলা শেষ হতে আর মিনিট দুই বাকি। মাঠভর্তি দর্শক। তারা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। নানান বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিতে পাঠে টিকে থাকা দায়। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। একদিকে খালি পায়ের নিখাদ এগার বাঙ্গালী যা বলা যেতে পারে পরাধীনতার শিকল হাতে পরা ভারতীয় আর অন্যদিকে সুগঠিত, উদ্ধত, শ্বেতকায় পারদর্শী এগার গোরা ফুটবল খেলোয়াড়, তখন অবধি ফলাফল—মোহনবাগান (১)—ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট (০)। তখনই ফরোয়ার্ড শিবদাস ভাদুরীর একটা গোলমুখী পাস ধরে আগুয়ান সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ বলটাকে পায়ের চেটোয় ধরলেন। সামনে তখন একমাত্র ইস্ট ইয়র্কশায়ারের গোল রক্ষক। নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা, শক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একটা গোলমুখী শট্। আর তারপর ইতিহাস, যে ইতিহাস আজও আমাদের এই শতবর্ষ পরেও প্রেরণা দেয়। আবার নতুন করে ভাবতে শেখায় যে একতার কোন বিকল্প নেই। দলমত নির্বিশেষে যদি একতাবদ্ধ হয়ে আমরা কিছু করার জন্য সচেষ্ট হই তবে সেটি অধরা থাকে না। সেই দিন মাঠে আগত হাজার হাজার দর্শকদের সামনে সেইজয় শুধুমাত্র নিখাদ আই. এফ. এ. শীল্ড জেতার জয় নয়। সেই জয় ছিল ভারতমাতার একফোঁটা চোখের জলের দাম। ২৯শে জুন ১৯১১ সেইদিন ছিল ভারতীয় ফুটবলের স্মরণীয় ইতিহাস যা আজও সমলিন।

মোহনবাগান ক্লাব ও তার প্রেক্ষাপট :

১৮৫৪ সালে প্রথমবার কলকাতা তথা ভারতীয়রা সম্ভবতঃ প্রথম ফুটবল খেলা সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে শিখেছিল। একটা গোল মত বস্তুকে দুই দিক থেকে এগার জন করে কিছু গোরা মাঠ জুড়ে দাপাদাপি করে এদিক ওদিক করছে দেখে সেদিনের বঙ্গবাসী এক নতুন ধরনের খেলার সাথে পরিচিত লাভ করে। যদিও সেই দিনের সেই উৎসাহী নেটিভরা কাছ থেকে সেই খেলা দেখার সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। দুর থেকেই তা দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সেময় ক্যালকাটা ক্লাব ও ব্যারাকপুরের অভিজাত ইংরেজ রেসিডেন্টরাই মূলতঃ ফুটবল খেলত। নেটিভরা ছিল ব্রাত্য তবে ফুটবল খেলাটিকে যতই ইংরেজরা নেটিভদের থেকে দুরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও বাঙালিদের মধ্যে খেলাটি জনপ্রিয় হতে বেশী সময় লাগেনি। কলকাতার কিছু অভিজাত ও ধনী বাঙালিদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ফুটবল ধীরে ধীরে বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন স্বদেশী ক্লাবের জন্ম হয়, সেই সময় শ্যামবাজার অঞ্চলে মোহনবাগান ভিলা নামে একটি মার্বেল প্যালেস ছিল। তারই সামনে একটা এক চিলতে মাঠে দুখীরাম মজুমদারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কিছু ছেলে ফুটবল প্রাক্টিস করত।

একই সময়ে বাগবাজারের সেনেদের তত্ত্বাবধানে চলত বাগবাজার ক্লাব। পরে উত্তর কলকাতার বনেদি বোস, সেন ও মিত্রপরিবার ১৮৮৯ সালের ১৫ই আগস্ট আইনজীবি ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে বসে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন মোহনবাগান ক্লাব, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং। ১৫ই আগস্ট ভারতীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ দিন। কারণ ১৯৪৭ সালের এই দিনেই আমরা ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়েছিলাম, আবার ভারতীয় ফুটবলেরও স্মরণীয় দিন। কারণ এই দিনই দেশের একমাত্র ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই শুরু, তারপর আর মোহবাগানকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, প্রতিষ্ঠা কালে মোহনবাগান ক্লাবের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু (সাঃ সম্পাদক) মানিকলাল সেন ও যতীন্দ্রনাথ মিত্র।

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাল ফুটবলার রা মোহনবাগান ক্লাবে খেলতে আসতে লাগল ও পরে কোচবিহার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মোহনবাগান ক্লাবের মোহন সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে।

১৯১১র প্রেক্ষাপট :

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ ছিল ভারতবর্ষের গৌরবান্বিত সূর্যের অস্ত যাবার আর ব্রিটিশ আধিপত্যকারী ঘন কালো অন্ধকারের সূচনা, ব্রিটিশদের সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদীনীতি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে থাকে। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহতে সেই সুদীর্ঘ ক্ষোভের আগুনের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের পরাজয়ের পর মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সূর্য অস্তমিত হবার নয়। সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সহ খেলাধূলোতেও ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হতে শুরু করে।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের গঠন ভারতীয়দের নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার রসদ যোগায়।

১৮৯৩ সালে ইংরেজরা কলকাতায় বিভিন্ন ক্লাবদলগুলোকে নিয়ে IFAশীল্ড শুরু করে। যেটিকে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগীতা FA কাপের অনুকরণে তৈরী করা হয়েছিল এবং গুরুত্বের দিক থেকেও সমসাময়িক ছিল। প্রথমদিকে লন্ডনের বিভিন্ন ক্লাব ও ভারতে অবস্থিত ইংরেজ ক্লাবগুলো এই টুর্নামেন্ট খেলত। পরে ভারতীয় দর্শকদের উৎসাহ কে মান্যতা দিয়ে কিছু দেশীয় ক্লাব দলগুলোকেও খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

১৯০৫ সালে কার্জন বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। যার প্রতিবাদে বঙ্গদেশ জুড়ে আন্দোলনের ঢল নামে। ১৯০৮ সালে শহিদ ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতির মত কাজ হয়। এমনই এক অশান্ত সময়ে ১৯১১ র জুলাই মাসে I.F.A. শীল্ডের খেলা শুরু হয়, সে বছর মোহনবাগান ক্লাব ধারে ও ভারে ছিল অনেক বেশী শক্তিশালি। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় সেই সময় মোহনবাগান ক্লাবে খেলত। অভিজ্ঞ ও দক্ষ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত মোহনবাগান ক্লাব সেই সময় স্বদেশী ক্লাবগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে এবং মানসিকতা জন্মে ছিল যে তারা যেকোন চ্যালেঞ্জ নিতে পারে।

সেই সময় মোহন বাগানের সেরা এগার ছিল —

(১) হীরালাল মুখার্জী —গোলে
(২) ভূতি শুকুল —রাইট ব্যাক
(৩) সুধীর চ্যাটার্জী— লেফট ব্যাক
(৪) মনমোহন মুখার্জী— রাইট ব্যাক
(৫) রাজেন সেনগুপ্ত —সেন্ট্রাল হাফ
(৬) নীলমাধব ভট্টাচার্য — লেফট হাফ
(৭) কানু রায়—রাইট আউট
(৮) হাবুল সরকার—রাইট ইন
(৯) অভিলাষ ঘোষ —সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ড
(১০) বিজয়দাস ভাদুরী—লেফট ইন
(১১) শিবদাস ভাদুরী—লেফট আউট (ক্যাপ্টেন)।

যাত্রাপথে :

১০ই জুলাই মোহনবাগানের প্রথম রাউন্ডের খেলা ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স ক্লাবের সাথে, সেখানে দুই ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ ও বিজয়দাস ভাদুরীর দুর্দান্ত গোলে মোহনবাগান ২-০ গোলে জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হয় ১৪ই জুলাই মোহনবাগান আর রেঞ্জার্স ক্লাবের মধ্যে যেটিতে মোহনবাগান শিবদাস ভাদুরীর জোড়া গোলে রেঞ্জার্স ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে।

তৃতীয় রাউন্ডের খেলা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ম্যাচের জয়ী দলই কেবল সেমিফাইনালে ওটার ছাড়পত্র পেত। ১৯শে জুলাই সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিজয়দাসের গোলে মোহনবাগান রাইফেল বিগ্রেডকে ১-০ গোলে পরাস্ত করে।

স্বপ্নদেখার শুরু :

১৯১১র সেমিফাইনালে প্রবেশে মোহনবাগান ক্লাবের উপর দেশীয় জনতার প্রত্যাশা দ্বিগুণ হয়ে যায়। গোরাদের হাতে প্রতি পদক্ষেপে হেনস্তা হতে হতে দেশীয় জনগণের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। জাতীয়স্তরে ইংরেজদের দমন পীড়ন নীতি দেশীয় জনগণের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশদের আত্মঅহংকারে আঘাত হানা একান্ত প্রয়োজন বলে সবাই মনে করতেন। গোরাদের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে যথার্থ জবাব দেবার প্রস্তুতির ক্ষেত্রও তৈরী হচ্ছিল। মোহনবাগান সেমিফাইনালে ওঠায় সেই প্রত্যাশার অভিমুখ খেলার মাঠের দিকে ঘুরে যায়।

২৪ জুলাই সেমিফাইনালে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কোন পক্ষই কাউকে ছেড়ে কথা বলছিল না। খেলাটা ছিল মোহনবাগানের সাথে মোহনবাগান মিডিলসেন্স ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়।

ফিরতি সেমিফাইনাল ম্যাচে (২৫ মে ১৯১১) মোহনবাগান মিডিলসেন্সকে ৩-০ গোলে পরাস্ত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

২৯শে জুলাই ১৮৯৯ :

ভারতীয় ফুটবলের স্মরণীয় দিন। হাজার হাজার দর্শকদের মাঠমুখো হওয়া ছিল এখানকার মতই, শুধু পার্থক্য এই যে দর্শকদের সেদিনের সেই খেলা দেখতে যাওয়া ছিল সেই সুযোগ যা উদ্ধত ব্রিটিশদের মাথা নত করে দেবার দিন। মোটামুটি আশি হাজার দর্শক সেদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন। একদিকে খালিপায়ে, এগার বাঙালির সাহসের সাথে সবদিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অভিজ্ঞ এগার জন গোরা খেলোয়াড় যা শুধুমাত্র ফুটবল খেলা হিসাবেই সীমাবদ্ধ ছিল না ছিল এক শেষযুদ্ধের প্রস্তুতির পর্যায়।

ফাইনালের মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ছিল ইংলান্ডের ইষ্টইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট, মূলতঃ ব্রিটিশ সেনা প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছিল। এই দলটি দীর্ঘদিন একসাথে থাকার জন্য ধারে ও ভারে ছিল অনেকবেশী শক্তপ্রতিপক্ষ।

খেলা শুরু হয়েছিল বিকাল ৫.৩০ মিনিটে এ। ইষ্টইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলছিল। মোহনবাগানের রক্ষণ সেই আক্রমণ সামাল দিয়ে কানু রায়, হাবুল গুপ্ত, শিবদাস ভাদুরীদের মাধ্যমে প্রতি আক্রমণে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে একটা বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জ্যাকসনকে ফাউল করেন রাজেন সরকার, ইস্টইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট ফ্রিকিক পায়। ফ্রিকিক থেকে জ্যাকসন নিজেই শট নেন যা গোলরক্ষক হীরালাল মুখার্জীকে পরাস্ত করে। ইস্টইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট এক গোলে এগিয়ে যায়। মাঠে উপস্থিতি ব্রিটশ দর্শকরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে ও নেটিভদের উদ্দেশ্যে নানা মন্তব্য করতে থাকে। ভারতীয় দর্শকদের তখন সেই সমস্ত কটুক্তি ও অঙ্গভঙ্গি হজম করতে হয়। ইস্টরেজিমেন্টের খেলোয়াড়রা আরও চাপ বাড়ায় মোহনবাগান দলের উপর। বিরতির বাঁশি বাজা অবধি মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে।

বিরতিতে ক্যাপ্টেন শিবদাস ভাদুরী তার সহখেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করেন। সকলে মিলে চোয়াল শক্ত করে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে না জিতে ফিরে আসবে না। যেভাবেই হোক গোরাদের মুখের উপর যোগ্য জবাব দিতে হবে। এটা বাঙলা তথা ভারতমাতার সম্মান রক্ষার সংগ্রাম।

প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতি আক্রমনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অর্ধ শুরু হয়। কিন্তু কিছুতেই মোহনবাগান তাদের কাঙ্খিত

গোলের রাস্তাটি খুঁজে পাচ্ছিল না। খেলা ভাঙ্গার মিনিট দশেক আগে আগুয়ান একটি পাশ ধরে চমৎকার ড্রিবল করে ক্যাপ্টেন শিবদাস ভাদুরী সামনে একা ইংরেজ গোলরক্ষকে পেয়ে যান এবং জোরাল শটে গোল করেন। হাজার হাজার ভারতীয় দর্শক গর্জন করে ওঠে।

খেলাভাঙ্গার মিনিট দুই আগে আসে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত যেটা সহস্রাধিক ভারতীয় দর্শক মনে প্রাণে চাইছিলেন। শিবদাস ভাদুড়ীর একটা চমৎকার পাশ আগুয়ান ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ একটি দুরন্ত ভলির মাধ্যমে ইস্টইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের গোলরক্ষককে পরাজিত করে জালে বল জড়িয়ে দেন। আশি হাজার দর্শকদের প্রাণপণ উত্তেজনা আনন্দের বারুদের মত ফেটে পড়ে।

কিছু সংবাদপত্রের প্রতিবেদন :

মোসলেম পত্রিকা—তারা লিখেছিল মোহনবাগানের এই জয়ে তাদের সদস্য সমর্থকগণ আনন্দে মাঠে গড়াগড়ি দিয়েছিল, আনন্দে বাজি ফাটিয়েছিল। মোহনবাগান খেলোয়াড়রা যখন IFA প্রেসিডেন্ট মিস্টার ফ্রাঙ্ক. ডাব্লু. কাটার এর থেকে শীল্ডটা হাতে নেন তখন দর্শকরা বাহবা দিতে থাকে আর মিসেস ওয়াটসন যখন এগারজনকে গোল্ড মেডেল দেন তখন দর্শকদের উৎসাহ ছিল দেখার মত।

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল— তিনটা সেরা মিলিটারি টিমকে একটা বাংলার টিম পরাজিত করেছে। মাঠে উপস্থিত আশি হাজার দর্শক যোগ্য দলের জয় উপভোগ করেছেন।

বেঙ্গলী পত্রিকা লিখেছিল— "ধন্যবাদ আমার বন্ধুরা, তোমরা সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে দেখিয়েছ তোমাদের সাহসিকতার প্রশংসা করি।

বর্তমান সময়ের মূল্যায়ণ ঃ

আজ থেকে একশো বছর আগে শুধুমাত্র সাহস, বুদ্ধি আর অদম্য জেদকে ভরসা করে মোহনবাগানের IFA শীল্ড জয় সেই যুগের পরাধীন ভারতবাসীর কাছে ছিল এক উল্লেখযোগ্য প্রেরণা— আমরাও পারি উদ্ধত দর্পিত গোরা মাথাগুলোকে মাথা হেঁট করে দিতে। আমরাও পারি সফল হতে, জিততে, সফলতা ছিনিয়ে নিয়ে আসতে। হাজার হাজার কোটী কোটী ভারতবাসী যারা তখনও অবধি মানত যে ইংরেজরা অপরাজেয়। সেই ধারণাকে ভুল ভাঙাতে খালি পায়ে লড়াই করা এগারজন খেলোয়াড় শুধু মাত্র ফুটবল যোদ্ধানয়, তারা কোটী কোটী ভারতবাসীর প্রতিবাদী মুখ। আজ একশো বছর পরে সেদিনের সেই পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে মোহনবাগান ক্লাবের সংগ্রাম শুধুমাত্র খেলা জেতার মত ঘটনা হিসাবে বিচার করলে চলবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি ভিন্ন ও অগ্রগণ্য স্রোত হিসাবে বিবেচিত হবে।

বর্তমান বছর মোহনবাগান ক্লাব বিভিন্ন ভাবে এই দিনটিকে স্মরণ করে চলেছে। সেদিনের সেই দামাল এগার বিগ্রেডকে নিয়ে সিনেমা করা হয়েছে যেটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সিনেমা হলে দর্শক প্রশংসিত হয়েছে। IFA শীল্ডের জয়ের এই শতবর্ষ উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাবের সেদিনের সকল সদস্যকে মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। পরিশেষে এটা বলা যায়— আজও ২৯শে জুলাই ১৯১১র প্রেক্ষাপটে আমরা ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত।

প্রবন্ধ

রেজিষ্ট্রেশনের বিবর্তন

বাবলা ঘোষ

যুগ্ম মুদ্রাঙ্ক রাতস্ব মহাধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ

"ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"

আর পাঁচজনের মত আমিও ছোট বেলায় এই ঘুমপাড়ানী ছড়া গান শুনতাম মা ঠাকুরমাদের মুখে। না বুঝেই এই ছড়াগান তখন আমিও গেয়ে যেতাম—অর্থ বুঝতাম না। আজ বুঝি তার অর্থ। আজ বুঝি, এই ছেলে ভুলানো ছড়াগানের ভেতর কত বড় ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

বাঙালীর অন্নগত প্রাণ। সেই জন্যই বাঙালী হয়তো অতিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়। নদীমাতৃক এই বাংলায় বৃষ্টির অভাব ছিল না সাধারণত। এই বৃষ্টি প্লাবিত সমতল ক্ষেত্রে এক মুঠো ধান ছড়িয়ে দিতে পারলেই বাঙালীর পেটের ভাতের অভাব হ'ত না। নদী-খাল-বিলে ছিল অজস্র মাছ। আর গোয়াল ঘরে ছিল দুগ্ধবতী গাভী। তাই বাঙালী সুখেই ছিল—মাছে ভাতে এবং দুধে ভাতেও। তাইতো এই ভেতো বাঙালীর বাপ্‌দাদার ভিটের প্রতি একটা অদ্ভুত টান। নিতান্ত দায়ে না পড়লে এর চতুঃসীমা ত্যাগ করতে চাইতো না। যে বাস্তুভিটার ওপর দাঁড়িয়ে তার চৌদ্দ পুরুষ শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য কাটিয়ে পুণ্যলোকে প্রস্থান করেছেন, বাঙালীর কাছে তার প্রতিটি ধূলিকণা ছিল "স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

কিন্তু "চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।"

মাঝে মাঝেই বাঙালীর শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা, বাদশাদের আক্রমণে। মগ-ফিরিঙ্গিদের দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। মগের মুল্লুক কথাটি সেই থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এক সময় বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শালবন পেরিয়ে উড়িষ্যার গিরিনদী পেরিয়ে মারাঠী অশ্বারোহীর দল হাজারে হাজারে বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং লুঠপাট চালাতে লাগলো। বাংলার ইতিহাসে তারই নাম "বর্গীর হাঙ্গামা"।

আমরা জানি যে এই বাংলা তথা ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন ক্ষমতার রাজারা দেশ শাসন করতেন আবার সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে যুদ্ধবিগ্রহও লেগে থাকতো। চলত অবাধ লুঠতরাজ। এই কৃষিপ্রধান দেশে রাজস্বের উৎস ছিল এই কৃষিজমিই। হিন্দুরাজত্বে যে পরিমাণে ভূমির কর নির্দিষ্ট ছিল, সম্রাট আকবরের সময়ে-তা দ্বিগুণ হয়ে গেল। নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ সেই রাজকর বৃদ্ধি ক'রে তার ওপর কতকগুলি 'বাজেজমা' চাপিয়ে ছিলেন। এইভাবে ভূমি রাজস্ব কখনো কখনো তিনগুণ চারগুণও ধার্য্য হত। অত্যাচারিত চাষীগণ দেশ ত্যাগে বাধ্য হতেন কখনো কখনো। দেশে দেখা দিত দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর।

কিন্তু একথাও ঠিক যে সকল শাসকেরাই শুধুই শোষক ছিলেন না। কেউ কেউ সুশাসকও ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ পথ-ঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, ধর্মাচরণের জন্য মন্দির মসজিদ নির্মাণ, বিচারব্যবস্থা, জমি জরিপ ইত্যাদি বিষয়ে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমেই চলে আসে শের শাহ-এর কথা। গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড এর কথা আমরা সকলেই জানি। কৃষি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে শের শাহ যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার উৎকর্ষ এমন যে পরবর্তী যুগে সেই নীতি অনুসরণ করা

হয়েছে। সযত্নে জমির জরিপ ও মাপজোখ সেরে রাজা চাষীদের সঙ্গে সরাসরি বন্দ্যোবস্ত করতেন। সাধারণতঃ স্থির হত যে গড়ে জমিতে যে শস্য উৎপাদন হয় তার এক তৃতীয়াংশ হল রাষ্ট্রের প্রাপ্য। শস্য দিয়ে বা টাকা দিয়ে চাষী তার পাওনাগণ্ডা মিটাতে পারতো। বন্দোবস্ত পাকা করার জন্য চাষী দিত ''কবুলিয়ত'—রাজার কি প্রাপ্য তাতে তা স্বীকার করা হ'ত। আর রাজার পক্ষ থেকে জমি সম্পর্কে চাষীর অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য দেওয়া হত পাট্টা'। এত বড় দেশে রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করত আমিন, মকদ্দম, শিকদার, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীগণ। শোনা যায় যে শের শাহ-এর নাকি হুকুম ছিল যে খাজনা ঠিক করার সময় কঠোর হবে না কিন্তু আদায়ের বেলা দয়া দেখানো চলবে না। অনাবৃষ্টি, শস্যহানি হলে খাজনা মুকুবও হত। প্রয়োজনে চাষী ধার নিতেও পারতো। ভাবতে অবাক লাগে ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে শের শাহ কী আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

মহামতি আকবর এর সুশাসন এর কথা সর্বজনবিদিত। কোষাগার পরিপূর্ণ রাখা, পরগনার রাজস্বের অঙ্ক সুনিশ্চিত করা, জায়গিরদারদের মাসহারা ও আমিরদের মনসবের নিয়ম টোডরমলকে দিয়ে তিনি করিয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শে সারা দেশকে বারোটি সুবায় বিভক্ত করে দশসালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করা হয়েছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগনা, কতকগুলি পরগনা নিয়ে সরকার (জেলা) এবং কতকগুলি সরকার নিয়ে একটি সুবা গঠন করা হয়েছিল। জমি পরিমাপের জন্য প্রথমে ৫৫ গজের ফিতে, পরে ৬০ গজের মাপকাঠির প্রবর্তন করা এবং জোড়ে জোড়ে লোহার কড়া পরানো হত যাতে সংযোগ স্থলে ফাঁক না পড়ে। টোডরমল-রচিত আইন-ই-আকবরি' থেকে আমরা এইরকম অনেক তথ্য পাই।

রাজা-বাদশাহরা ক্রয়-বিক্রয়, গ্রামাঞ্চলের ভূমিরাজস্ব, কর-আদায়, কর্মী-কর্মচারীদের বেতন টাকায় হিসেব করতেন, কিন্তু দিতে হত পয়সায়। অকবরের আমলে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল—বর্ষার জমিতে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক প্রজার, বাকি অর্ধেক বাদশাহর। এই দ্বিতীয় ভাগের এক চতুর্থাংশ খরচ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যয় ধরে শস্যের এক তৃতীয়াংশ বাদশাহ পেতেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকেরা পেতেন। ইক্ষু ইত্যাদি উচ্চ ব্যয়বহুল শস্যের ক্ষেত্রে শস্যের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-সপ্তমাংশ বাদশাহের অধিকারে আসত।

কিন্তু আমাদের ধারনার অতীত যে সমাজ-রাষ্ট্রের পরিচালনা বিষয়ে আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে মহাপণ্ডিত কৌটিল্য কী অদ্ভুত জ্ঞানমার্গের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী ঘরবাড়ি বিক্রি করতে হলে প্রথমে জ্ঞাতি, পরে প্রতিবেশী ও তারপর ঋণদাতা ধনিকই প্রথম দাবীদার। কোন বাড়ি বিক্রি করতে হলে নিকটবর্তী চল্লিশটি পরিবারের প্রধানদের উপস্থিতিতে বাড়ি বিক্রির কথা উচ্চরবে ঘোষণা ক'রে সেই বাড়ির সীমা, বাগান, দীঘি ও মালিকানার কথা এবং মূল্য জানিয়ে দেবে। তাতে বিক্রেতার জ্ঞাতিরা কেউ যদি আপত্তি না জানায় তবে ক্রেতা ঐ মূল্যে সম্পত্তিটি কিনতে পারবে। কেউ যদি কোন কৃষিক্ষেত্রাদি কেনে, চুক্তিতে চাষের জন্য নেয়, বন্ধক নেয়, ভাগচাষে নেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ঠিকমত যত্ন করবে। তা না হলে ক্ষতির দ্বিগুণ দণ্ড দেবে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই ধরণের এমন সব দিক নির্দেশ করে গেছেন যা পরবর্তী রাজা বাদশাহদের তো বটেই এমনকি আজও অনেক শাসক-কুলের পথনির্দেশিকার কাজ করে চলেছে।

এই পর্যন্ত আমরা ভূমি বা জমির মাপজোখ, সীমা নির্দ্ধারণ, রাজস্ব আদায়, কিছু কিছু দলিল দস্তাবেজের উল্লেখ পেলেও এই জমি বা ভূমির হস্তান্তর বা দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত কোন নথির নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন এর কোন প্রমাণ পেলাম না। এর পরেই আসে মুর্শিদকুলীখাঁ, আলিবর্দীখাঁ, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা, মীরজাফর বা মীরকাশেম এর শাসনকাল। এঁদের আমলে নিবন্ধীকরণ এর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত শক্ত হতে থাকে এবং ক্রমশ রেজিষ্ট্রেশন আইনের সূত্রপাত ঘটে এবং ধাপে ধাপে তার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটতে ঘটতে শেষে 'The Indian Registration Act, 1908' তৈরী হয়।

কলকাতা রেজিষ্ট্রেশন অফিসের মহাফেজখানায় ১৮৬৫ সাল থেকে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের রেকর্ড আজও অক্ষত রয়েছে। ১৯১৪ সালে রীতিসম্মত রেজিষ্ট্রেশনের নিদর্শণ পাওয়া যায় —'Rule Ordinance and Regulation' নিবন্ধন বিধিতে যা ১৭৮১ সালের ৯ই জানুয়ারি 'কাউনসিলে' পাশ হয় এবং ১লা ফেব্রুয়ারি ১৭৮১ তারিখে 'Supreme Court of Judicature in Bengal'-এ নথিভুক্ত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ''for the better management of the affairs of the East India Company as well in India as in Europe''। এছাড়া

জমি, বাড়ি রেজিষ্ট্রি এবং জালিয়াতি বন্ধ করাও উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই নিয়ন্ত্রণবিধির সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী ছিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ। মিষ্টার এড্ওয়ার্ড টিরেট্টা যাঁর নামে কলকাতায় একটি মার্কেটের নামকরণ করা হয়েছে, মাত্র একহাজার সিক্কা (Sicca) টাকার পারিশ্রমিকে কলকাতার প্রথম সার্ভেয়র, জমি বাড়ির রেজিষ্ট্রার ও সেটেলমেন্ট আধিকারিক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই পদটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল—(১) জমি ও বাড়ীর রেকর্ড এর জন্য মিউনিসিপ্যালিটি (২) ল্যান্ড রেকর্ড এর জন্য কালেক্টর এবং (৩) জমি বাড়ির হস্তান্তর নথিভুক্তির জন্য রেজিষ্ট্রার অব্ অ্যাসিওরেন্সেস্।

এরপর রেগুলেশন ১৭৯৩, ১৭৯৬, ১৮১২, ১৮২৪ এবং ১৮৩২ এর দ্বারা কিছু কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে। তারপর আসে রেজিষ্ট্রেশন আইন ১৮৩৮ ও ১৮৪৩। এই ১৮৪৩ এর আইনে বলা হয় যে বিক্রয়, দানপত্র, মর্টগেজ দলিলগুলি নিবন্ধীকৃত হলে অনিবন্ধীকৃত দলিলগুলি থেকে অগ্রাধিকার পাবে। ক্রমে সংশোধিত আইন ১৮৪৫, ১৮৪৭, ১৮৫২, ১৮৫৬ ও ১৮৫৯ পাশ হতে থাকল। সংশোধিত আইন ১৮৬৪-এর মাধ্যমে দুটি অভূতপূর্ব ধারা সংযোজিত হল অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নিবন্ধন বা Compulsory Registration এবং ঐচ্ছিক নিবন্ধন বা Optional Registration যা আজকের আইনের যথাক্রমে ১৭ ও ১৮ ধারায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে কতদিনে রেজিষ্ট্রি করা যেতে পারে, কি কি রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি।

এইভাবে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা পেলাম Indian Registration Act, 1908 যা ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়ে আজও প্রচলিত আছে। ইতিমধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে এই শতাব্দী প্রাচীন আইনকে ঢেলে সাজানোর জন্য একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ।

বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের সুবিধার্থে মাঝে মাঝে স্টেট্ এ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছেন। এসেছে ফাইলিং অব ট্রু কপি রুল্স্, ডিড্ রাইটার্স রুলস্, কপিরাইটার্স রুলস্, প্রিভেনশন অব আন্ডারভ্যালুয়েশ অব- ইনস্ট্রুমেন্টস্ রুলস্ যা স্ট্যাম্প অ্যাক্ট ১৮৯৯ এর অধীনে মার্কেট ভ্যালু বিষয়ে যুক্ত। এই মার্কেট ভ্যালু প্রবর্তন হয় ১৯৯৪ সালের ৩১ শে জানুয়ারি তারিখে। এই আইন প্রবর্তন এর ফলে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখযোগ্যরূপে। সম্পত্তির বাজারদর যেহেতু পরিবর্তনশীল আমাদের ডাইরেক্টরেট ও তাই বাজারের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজার দর বৃদ্ধি করে থাকে এবং সাথে সাথে রাজস্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের নিবন্ধন আধিকারিকদের অনেক দায়িত্ব বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। বেড়েছে পদ মর্যাদাও।

তারপর এসেছে ই-গভর্নেন্স প্রোগ্রাম্। পাইলট প্রোজেক্টে সাফল্যলাভের পর ২০০৭ সাল থেকে ধাপে ধাপে দ্রুতগতিতে রেজিষ্ট্রেশন অফিসগুলি কম্পিউটার-চালিত করা হয়েছে পি-পি-পি মডেলে। লোকে দিনে-দিনেই দলিল ফেরত পাচ্ছেন। রাজ্যের ২৩৯ টি অফিসের মধ্যে ২৩৮টিই কম্পিউটার চালিত। NIC দ্বারা তৈরী 'CORD' সফটওয়্যার সারা দেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে—স্বচ্ছতা, দ্রুততা, দ্বায়বদ্ধতাই যার লক্ষ্য। মানুষের স্বার্থে নূতন নূতন অফিস খোলা হচ্ছে। জনগণের সুবিধার্থে আরও নানান্ পরিকল্পনা সরকারের আছে। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট আরও জনমুখী করার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ল্যান্ড টাইট্লিং বিল প্রবর্তিত হতে চলেছে। বর্তমানে NLRMP বা National Land Records Modernization Programme এর পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে হাওড়া জেলার রানীহাটি অফিসে। সাফল্য পেলে দ্রুত সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রেজিষ্ট্রেশনের সাথে সাথে মিউটেশনের কাজ একই সঙ্গে শুরু করা এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। মার্কেট ভ্যালু জানার সুবিধা Website -এ দিয়ে দেওয়া হবে শীঘ্রই। মোদ্দা কথা, রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটে চলেছে। আরও অনেক জনকল্যাণকামী পরিকল্পনা সরকারের আছে। এজন্য সর্বস্তরের আধিকারিক, কর্মী এবং জনগণের আশু ও আন্তরিক প্রয়াস কাম্য।

ACCEPTABILITY OF FREE CULTURE IN A SO-CALLED DEMOCRATIC COUNTRY

Susanta Kumar Chowdhury

Deputy Inspector General of Registration, Range —I, Alipore

It was the fact that on 23rd day of November, 2010, Drama Festival organized by **Bengal Natya Academy** was inaugurated with much fanfare, upholding a streak of lofty idealism and backbone in the matter of progress of unshackled Arts and culture.

Let arts and culture of all types be flourished in normal manner without hindrance or intervention, was the emerging emboldened message or slogan of that inaugural ceremony.

But before long, when we heard the news of blockade to stage the drama **"Pasu Khamar"** or **"Animal Firm"** (produced by **"Pancham Baidik")** hollowness of the inaugural, message was exposed, emanating lofty idealism of that inaugural ceremony relegated to nothingness, actualization of the noble assurance was missed by that event of obstruction.

Aftermath was that a fresh cloud of controversy had emerged over that sickening event of the 14th March, 2011.

Contretemps of the 14th March, 2011 vindicates, smell of the work, 1984 (written by **George Orwell)** in 2011.

This legendary noble work has been made against totalitarianism. **Orwell** in his work has shown how tyranny reduces humanity to a pulp. **"Big brothers"** become a synonym for abuse of power to crash civil liberties. This novella of **George Orwell** is a cry against a revolution betrayed.

Hence premise, which emerges from the controversial drama like **"Pashu Khamar"** or **"Animal Firm",** is against the backdrop of Russian Revolution, this was one of the last century's sharpest anti-stalanist allegories.

That the plays like **"Pashu Khamar"** had fallen into rough weather was not the first occurrence.

It is needless to say that since long back till now many attempts have been making to gag or muzzle the voices of outspoken persons.

Down the memory line, if we recall past years of the history we will find ample examples of such incidents fraught with shame.

Glaring instance of torture or tyranny on theatre personalities have been happening since inception of the British rule in our country.

In 1876 an act was made to restrain free spoken dramatical performances. **"Nildarpan"** drama made by **Sri Dinobandhu Mitra** had upheld the baton to project the contemporary dramatical performances from the cluches of the repressive law of the British regime. **"Nildarpan"** had acted as the vanguard of

indigenous progressive dramatical culture.

Despite the end of the British rule in our country the repressive ignominious British law to control the latitude of freelance dramatist and others, was not revoked till 1967, when left front Government sitting in the Saddle abolished the tyrannious or tortuous law.

The people of progressive cultural arena exorcised the almost 135 years' old demon by imposing new control free norms to expedite the activities of the free culture.

It is hapless **to** note that inspite of repealing of that law in West Bengal, in 1972, P.LT.'s (Utpal Dutta's group) production "Tiner Toloyer" was stopped from staging at Rabindra Sadan Hall in Kolkata. It is very pathetic to say that in 1974, this notable dramatist and actor, was almost arrested for staging **"Duswapaner Nagari".**

After happening of 14th March, 2011's incident on **"Pashu Khamar"s** staging, events like death of ***Prabir Dutta*** and ***Safdar Hasmi*** have resurfaced in our minds. They are the few names who have dedicated their lives for the sake of progressive theatres. They have laid down their lives to raise the consciousness among common people of the streets. It is also to note that years back **"Winkle-Twinkle"** and other dramatical performances were stopped from staging at different places on the pleas of anti-establishment views.

Today 37 years on since 1974 repetition of the same incidents are conspicuous in our country.

It is a pity that despite expiry of 64 years since independence, the laid down norms of free culture in article 19 and 21 of our constitution, are being ignored or trampled till today.

Banning of high profile progressive flick like **"Aarakshan"** from releasing is nothing but a bizarre intervention into the freedom of speech, expression and criticism. The event like this does., not bode auspicious signal in the matter of free culture in democratic free society.

Now in my opinion, in democratic free country, different genre of culture inclusive of different cinematic productions may lay bare different views by showing their activities. Their views may not be biased to the establishment. Nevertheless their works should not be stopped from presenting or showing overtly in front of public.

There should exist tolerance to cope with all such circumstances.

Otherwise, whiff of autocratic rule under the facade of democracy will be exposing inevitably.

If streak of lofty idealism in the matter of free unfettered culture remains only in paper or book and does not walk the talk, then it will be an act of dichotomy, which is not at all desirable from a progressive free democratic country.

END

‘A’ for Apple, ‘AA’ for Steve

Abhijit Kr. Das

ACSR, West Bengal

The name “Steve” seems to have had a major influence in our life. From Steve McQueen to Rev. Jemes Stevens to Steve Waugh and in the last 10 years, it has been Steve Jobs.

Steve-Jobs (1955-2011), the father of the i-Pod, i-Phone and i-Pad died on Wednesday (5.10.2011) at the age of 56 in California. He was suffering from Cancer of Pancreas for last Seven years. He not only made Computers a necessity of modern life but he made the computer a “Thing of beauty” and thus a “Joy for ever” according to poetic interpretation. Here lay his genius. In a seminar in Stanford university, he addressed the students gathering by saying “stay hungry, stay foolish”.

He was son of unwed parents and was given away for adoption. In his youth, he dropped out of the College and became a hippy and sought “NIRVAN” in drugs but emerged as a genius who became, long before his untimely death, an icon. Steve Jobs was often seen in faded blue jeans, black turtle-neck jersey and round glasses on his eyes.

He named his company after “Apple”. More specifically, the LOGO of his company was “a bite on an apple”. The reasons of naming of his company are not exactly known but apples have played significant role in human history. A falling apple ushered in a new era of science and then there was Steve-Jobs.

In a 35-year career, he re-invented the computer (touch-skin),telephone and music industries and created Pixar, the studio behind the Oscar-winning Toy-story films. According to Stephen Spillberg, he was most talented after Thomas-Alva-Edition.

As Job’s health declined due to pancreatic Cancer, his Syrian-born immigrant father, who vanished from his life before he was born, made several attempts to contact him. Abdulfattah ‘John’ Jandali’s departure more than half a century ago prompted Joanne Schieble, Job’s mother to put her baby up for adoption.

Jandali now, at the age of 80 runs the Boomtown casino in Reno, Nevada. He had sent jobs several notes during his long battle with cancer. It was not until 2005 that Jandali learnt the real identity of his son. At one point he enclosed his medical records in case there was genetic information that would help. Jandali once said, “Syrian pride” had kept him from pressing to meet Jobs, in case his son thought he was after his money.

Just one and a half month before job’s death, he received a note that simply said, “Thank you”. That was the last he heared from jobs, who was adopted by a blue-collar California couple and never publicly acknowledged his biological father. During last few months in his life, he spent his times among his family members. He left a property worth 700 Crores doller. It is not known whether he has made any will or not.